১০

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ১৯১৪ সালে এবং এর পরিমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালে। ইউরোপের কয়েকটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র ব্যতীত প্রায় সকল রাষ্ট্রই এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। ইউরোপের বাইরেও এর বিস্তার ঘটেছিল। এই ব্যাপকতার জন্য এবং এই যুদ্ধের নাশকতার জন্য একে মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। ১৯১৪ সালে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভা শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ডের হত্যাকান্ডকে বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা আশু কারণ বলে মনে করা হয়। তবে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অতীতের ঘটনাবলীতে সন্ধান করতে হবে। জার্মানি-ফ্রান্সের পারস্পরিক সন্দেহ ও ঈর্ষা, অস্ট্রিয়াা ও রাশিয়ার তীব্র সংঘর্ষ, বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষোভ, ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের দুটি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিযোগিতার জন্য উত্তেজনা বৃদ্ধি, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বহু কারণের সম্মিলিত ফল হল বিশ্বযুদ্ধ।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- পাঠ-১ : পটভূমি ও যুদ্ধ
- পাঠ-২ : প্যারিস শান্তি সম্মেলন

পাঠ - ১

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি, এ যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ কারণসমূহ জানতে পারবেন;
- প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ জানতে পারবেন;
- প্রথম মহাযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে পারবেন;
- প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মানির পরাজয়ের কারণ জানতে পারবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভুমি-

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে বিগত একশ বছরের ইউরোপের ইতিহাসের গতি প্রকৃতির মধ্যে। দীর্ঘদিন সেখানে চলেছে ফরাসি বিপ্লব জাতীয়তাবাদের সাথে রক্ষণশীল মতবাদের দ্বন্দ্ব। পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু নতুন ব্যবস্থা তখনও সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। জাতীয়তাবাদ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে উগ্র মূর্তি ধারণ করেছে এবং অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে চেয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী চল্লিশ বছর আপাত দৃষ্টিতে শান্তি বজায় থাকলেও ঐতিহাসিকগণ একে সশস্ত্র শান্তির যুগ (Age of armed peace) আখ্যা দিয়েছেন। সমরসজ্জার ক্ষেত্রে, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই চলছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। নিম্নে প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হল ঃ

এক. উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে ইউরোপের দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উগ্র ও ক্ষতিকর ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদ। জার্মান পন্ডিত, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা এ কথা প্রচার করে থাকেন যে, জার্মানরা হচ্ছে বিশুদ্ধ আর্য এবং পৃথিবীর সব জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে উন্নত। তবে শুধু জার্মানি নয়, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ইতালি ও জাপানেও জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ রূপ নিয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধ বৃদ্ধি পায়।

ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্মানির কাছে আলসেস-লোরেন হারায়। এতে ফ্রান্স জার্মানির প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ইতালিভাষী অঞ্চলগুলো উদ্ধারের কথা ইতালি ভাবতে থাকে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাই বলকান অঞ্চলকে বিস্ফোরক করে তুলেছিল। অন্যদিকে জাপান নিজকে দূরপাচ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা মনে করতো। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই অঞ্চলে অস্ত্রের আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। এ সময় ইউরোপের সবদেশে মরণাস্ত্র তৈরির হিঁড়িক পড়ে যায়। অস্ত্রব্যবসায়ীসহ তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়।

দুই. বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক দশক পূর্ব থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার এবং এ জন্য ঔপনিবেশ বিস্তার নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়। ইউরোপের শিল্পায়িত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উৎপাদন এ সময় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য রফতানির জন্য নতুন বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই দেখা যায় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শিল্পপণ্য রফতানি এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য পুরনো উপনিবেশের সম্প্রসারণ এবং নতুন ঔপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। ইতিহাসে এই বিষয়টাকে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) বলা হয়। মার্কস থেকে লেনিন

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে উদ্বৃত্ত পণ্য সংকট সৃষ্টি করে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় (Highest stage of Capitalism) বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান ও উপনিবেশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

ক. ব্রিটেন ঃ বিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটেন পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। সমগ্র বিশ্বের মোট ঔপনিবেশিক অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ ছিল দেশটির দখলে। দুই গোলার্ধব্যাপী বিস্তৃত ছিল সাম্রাজ্য। উপনিবেশগুলিই ছিল তার শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান উৎস। এরপরও সে অতৃপ্ত ছিল। উপনিবেশ স্থাপনের সামান্যতম সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইতো না। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বুয়র যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি শক্ত ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা করে। এ সময় ইংরেজদের কূটনীতি মূলত পরিচালিত হচ্ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকেও ব্রিটেন মনোযোগ দেয়। তাই দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনার মুহূর্তে নৌ-বাণিজ্যের দিক থেকে ব্রিটেনের অবস্থান ছিল এক নম্বরে।

খ. ফ্রান্স ও বেলজিয়াম

ব্রিটেনের পর দ্বিতীয় সাম্রাজীবাদী দেশ হলো ফ্রান্স। দুই মহাদেশে (এশিয়া ও আফ্রিকা) ছড়ানো উপনিবেশ থাকা সত্ত্বেও দেশটির ইচ্ছা পূরণ হয়নি। জার্মানির আপত্তি অগ্রাহ্য করেও ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯১১ সালে মরক্কো সম্পূর্ণভাবে ফরাসি ঔপনিবেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বেলজিয়াম মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের বিস্তৃত ভূভাগ দখল করে নেয় এবং নির্দয় শোষণ শুরু করে।

তিন. পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ, প্রভাবাধীন অঞ্চল ও জার্মানির অনুপ্রবেশ

সাম্রাজ্যবাদ শুধু প্রত্যক্ষ ছিল এমন নয়, বিশ্বের অনেক অঞ্চলে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী অবস্থা বিরাজ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজ ও স্পেনীয়দের বিতাড়ন করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে দূরপ্রাচ্যের চীন স্বাধীন হলেও দেশটিতে ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসি, রুশ, জার্মান ও জাপানি সাম্রাজ্যবাদীগণ নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ছিল ব্রিটেন ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন।

এই প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক অঞ্চলের বিস্তৃতি হয় এবং সমগ্র অনুন্নত বিশ্ব অসংখ্য প্রভাবাধীন অঞ্চল (Sphere of Influence) -এ বিভক্ত হয়ে যায়। এতদিন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও একটি নীরব সমঝোতা ছিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই প্রতিযোগিতায় জার্মানির অনুপ্রবেশ ভারসাম্যটি (Blance of power) নষ্ট করে দেয়। এরপর থেকে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

জার্মান অনুপ্রবেশের পেছনে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। অটোফন বিসমার্ক নামে এক অসাধারণ কূটনৈতিক ১৮৯০ সাল পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি জার্মানিকে পরিতৃপ্ত রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করেন যার অর্থ দাঁড়ায় রাজ্য বিস্তারের কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপীয় কূটনীতিতে তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ১৮৭১-পরবর্তী ইউরোপের শক্তিসাম্য (Blance of power) বজায় রাখা। ফ্রান্সকে মিত্রহীন ও দুর্বল রেখে জার্মানির মিত্র রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধিই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তিনি ১৮৭৩ সালে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তিন সম্রাটের চুক্তি (Three Enperor's League) এবং ১৮৭৯ সালে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে গোপনে দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance)-সম্পাদন করেন। ১৮৮২ সালে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সাথে ইতালিকেও সংযুক্ত করেন। সমকালীন ইতিহাসের এই মৈত্রীবন্ধন ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) নামে পরিচিত। এরই ফাঁকে ১৮৮৭ সালে বিসমার্ক

রাশিয়ার সাথে (Re-insurence Treaty) স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয় যে, তৃতীয় কোনো শক্তিস্নারা আক্রান্ত হলে দুপক্ষই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। এভাবে বিসমার্ক তার অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতারস্নারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় রেখে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জার্মান রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন। এই জটিল কূটনৈতিক বিসমার্কের সাথে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে জার্মানির সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে তীব্র মতভেদ হওয়ায় বিসমার্ক পদত্যাগ করেন। ফলে ইউরোপের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। বিসমার্কের বিদায়ের পর দ্বিতীয় উইলিয়াম সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন করে সাম্রাজ্য বিস্তারের মনোনিবেশ করেন। তিনি পরিষ্কার করে বলেন, "The future of Germany lies of the sea" ফলে বিসমার্ক যেখানে ব্রিটেনের সাথে সংঘাত পরিহার করেছিলেন সেখানে উইলিয়াম তা অনিবার্য করে তোলেন।

উইলিয়াম প্রথমেই রাশিয়াকে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। কারণ, বলকান অঞ্চলে তিনি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করলে রাশিয়া ক্ষুন্ন হয়। অন্যদিকে ফরাসি শিল্পপতিরা রাশিয়ার শিল্পায়নে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী ছিল। এর ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ১৮৯৩ সালে ফরাসি-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে জার্মানি-রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এভাবে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির বিরুদ্ধে প্রথম ইউরোপীয় জোট গঠিত হয়। ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা চিন্তার কিছুটা উপশম হয়।

ইউরোপীয় রাজনীতির এই নতুন মেরুকরণের সময়টাকে ব্রিটেন গৌরবময় বিচ্ছিন্নতার (Splendid Isolation) নীতি অনুসরণ করছিল। তখন ব্রিটেনের আফ্রিকায় ফ্রান্সের সাথে, মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাথে উপনিবেশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। এ অবস্থায় ব্রিটেন জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী ছিল, কিন্তু উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং জার্মানির নৌশক্তির আকস্মিক বৃদ্ধিতে ব্রিটেন আতংকিত বোধ করে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে (Boer War) যুদ্ধে জার্মানি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বুওরদের সমর্থন করায় ব্রিটেন হতাশ হয়। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটেন জার্মান-বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। ১৯০৪ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে ফ্রান্স মিশরে ব্রিটেনের অধিকার যেমন মেনে নেয় তেমনি ব্রিটেনও মরক্কোয় ফ্রান্সের প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়।

এ ঘটনার তিন বছর পর ১৯০৭ সালে ব্রিটিন ও রাশিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এভাবে ইঙ্গ-রুশ-ফরাসি ত্রি শক্তি মৈত্রী (Triple Entente) গড়ে ওঠে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে পরস্পর বিরোধী দুই সামরিক জোটের উদ্ভবে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিনে দিনে সামরিক দ্বন্দ্বের দিকে এগুতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

চার ঃ পরস্পর বিরোধী সামরিক জোটের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ব্রিটেন-ফ্রান্স ও রাশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ত্রিশক্তি মৈত্রী ছিল ক্রমবর্ধমান জার্মানির প্রতিপত্তির প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরুপ। অন্যতম বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভের আশায় জার্মানি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মৈত্রীর অন্তর্ভূক্ত শক্তিগুলোর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এগুলো হল ঃ মরক্কোও আগাদির সমস্যা।

ক. মরক্কো ঃ উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত দেশ মরক্কোতে ১৯০৪ সালের ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। ফ্রান্স যখন মরক্কোতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন জার্মানি তীব্র আপত্তি জানায়। ১৯০৫ সালে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম স্বয়ং মরক্কোর তাঞ্জিরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং নিজেকে মুসলমানদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করে দেশটির স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। এটা ছিল ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রীর প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ডেলকাসে যুদ্ধের বিনিময়েও ফ্রান্সের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে চান। শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ সালে একটি

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মরক্কো সম্পর্কে একটি বোঝাপড়া হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, মরক্কোতে স্পেন ও ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার থাকবে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি মুক্তদ্বার নীতি (Open Door Policy) অনুসরণ করা হবে । এভাবে জার্মানি ইঙ্গ ফরাসি মৈত্রীতে ভাঙ্গন ধরাতে ব্যর্থ হয়।

খ. আগাদির সমস্যা

১৯০৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী মরক্কোয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি জার্মানির অর্থনৈতিক স্বার্থকেও স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে রাজধানী ফেজে একটি উপজাতির বিদ্রোহ দেখা দিলে ফ্রান্স তা দমন করেন। তখন 'প্যান্থার' নামে একটি জার্মান জাহাজ আগাদির বন্দরে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করে। ফরাসি ও জার্মান সামরিক উপস্থিতিতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডেও একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। ইঙ্গ-ফরাসি ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলার মুখে জার্মানি পিছু হটে। কারণ সব রাষ্ট্রই ১৯০৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী মীমাংসায় উপনীত হয়। ত্রি শক্তি মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর জার্মান প্রচেষ্টা দ্বিতীয়বারের মত ব্যর্থ হয়।

পাঁচ ঃ বলকান সমস্যা ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

বলকান সমস্যাকে কেন্দ্র করে মূলত প্রথম যুদ্ধের সূচনা হয়। বলকান সমস্যা ছিল বেশ জটিল ও পুরানো। এ অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থ ছিল দীর্ঘদিনের। সেই তুলনায় অস্ট্রিয়ার অনুপ্রবেশ অনেক পরের ঘটনা। অস্ট্রিয়া তুর্কি সাম্রাজ্য থেকে নবগঠিত রাষ্ট্র সার্বিয়াকে গ্রাস করতে চাইতো। সার্বিয়া ছিল রাশিয়ার মত স্লাভ জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ। অস্ট্রিয়ার স্লাভ অধিবাসীরা সার্বিয়ার সাথে সংযুক্ত হতে চাইতো। এই বিরোধে সার্বিয়াকে সমর্থন করতো রাশিয়া, আর অস্ট্রিয়ার পেছনে ছিল জার্মানি। জার্মানির ঔপনিবেশিক চিন্তাও ছিল। বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জার্মানির অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিলে ইংল্যান্ড ও রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়।

এদিকে অস্ট্রিয়ার সার্বিয়া সমর্থক স্লাভরা বিভিন্ন গোপন সমিতি গঠন করে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। প্রাক্তন সামরিক কর্মীদের নিয়ে গঠিত এরকম একটি দলের নাম ছিল 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' সার্বিয়া থেকেই এটি পরিচালনা করা হতো। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্ড ও তার স্ত্রী সোফিয়া বসনিয়া রাজধানী সারায়েভা ভ্রমণে এলে সার্বিয় সন্ত্রাসীদের হাতে তিনি নিহত হন। এটি 'সারাজেভো হত্যাকান্ড' নামে ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। এ হত্যাকান্ডের ফলে অস্ট্রিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সার্বিয়াকে চরমপত্র সম্বলিত কয়েকটি দাবি পেশ করে। সার্বিয়া কয়েকটি দাবি পূরণ এবং অন্যান্য দাবির জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। কারণ, এগুলির সাথে তার সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল। অস্ট্রিয়া তা অগ্রাহ্য করে ২৮ জুলাই ১৯১৪ সালে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে। এভাবে মহাযুদ্ধের সূচনা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ জলে ও স্থলে সর্বত্র বিস্তৃত হয়। স্থলভাগে গোটা ইউরোপ মহাদেশে যুদ্ধ চলতে থাকে। পশ্চিম রণাঙ্গনে, জার্মানি নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়াম দখল করে। বেলজিয়াম রক্ষার জন্য ব্রিটেনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে জার্মান সেনাদল রাইন সীমান্ত ও বেলজিয়াম-এর ভিতর দিয়ে নদীর স্রোতের মত ফ্রান্সে ঢুকে পড়ে এবং তারা রাজধানী প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। এরপর ফরাসি সেনাবাহিনী সেনাপতি জোসেফ জোফ্রির নেতৃত্বে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্যে লড়াই করে হানাদার জার্মানদের ফরাসি সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেয়। জার্মান ও ফরাসি সৈন্য বাহিনী পরিখা খনন করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এই সময় ব্রিটেনের ট্যাংক বাহিনী যুদ্ধরত ফরাসিদের সাথে যোগ দেয় এবং ভার্দুনের যুদ্ধে এই মিলিত বাহিনী জার্মানদের হটিয়ে দেয়। জার্মান বাহিনী তখন পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। মিলিত বাহিনী যুদ্ধরত ফরাসিদের সাথে যোগ দেয় এবং ভার্দুনের যুদ্ধে মিলিত হয়ে সোমের যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর বহু ক্ষয়ক্ষতি করে। এদিকে ইতালি জার্মান-অস্ট্রিয়ার মিত্রতা ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ইতালির বিরুদ্ধে তখন অস্ট্রিয়

বাহিনী আক্রমণ চালায়। এইভাবে কিছুকাল পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকে। পূর্ব রণাঙ্গনে, প্রথমদিকে রাশিয়ার সেনাদল জার্মানির গ্যালিসিয়া প্রদেশে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জার্মান সেনাপতি হিন্ডনবার্গের সহকারী সামরিক অফিসার লুডেনডফ রুশ সেনাদের জার্মানি থেকে বিতাড়িত করেন। ট্যানেনবার্গ ও অগাস্টোভোর যুদ্ধে রুশদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯১৫ সালে হিন্ডেনবার্গ রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া দখল করে নেন।

অন্যদিকে জার্মানির মিত্র তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ দার্দানালিস প্রণালী দিয়ে মিত্রশক্তির জাহাজ বন্ধ করে দেয়। তখন মিত্রপক্ষ গ্যালিপোলি আক্রমণ করে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে কুৎ-এল আমারার যুদ্ধেও মিত্রবাহিনী বিফল হয়। অবশ্য ইংরেজ সৈন্যদল বাগদাদ দখল করে নেয়।

সামুদ্রিক যুদ্ধে মিত্র শক্তির জাহাজগুলি জার্মান সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজদ্বারা প্রচন্ড ক্ষতির মুখোমুখি হয়। অসংখ্য ব্রিটিশ ও ফরাসি জাহাজ এই গুপ্ত আক্রমণ মহাসাগরের তলদেশে হারিয়ে গেছে। ডগারব্যাঙ্ক ও হ্যালিগোল্ডের নৌযুদ্ধে জার্মান ও ইংরেজ নৌবাহিনী প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্পুখীন হয়। তবে জার্মান নৌবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে জার্মান নৌবহর ইংরেজদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলে।

এদিকে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিন যুদ্ধ ত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করেন। ফলে রাশিয়া জার্মানির সাথে ব্রেস্টালিটভস্কের সন্ধি অনুযায়ী যুদ্ধ ত্যাগ করে। তখন জার্মানি তার পূর্ব রণাঙ্গনের সৈন্যদের পশ্চিম রণাঙ্গনের নিয়ে আসে। এই বাড়তি শক্তি নিয়ে জার্মানি পুনরায় বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ করে। এ সময় মিত্র শক্তির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। এশিয়ায় জাপানও জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

বেশ কিছু স্থল যুদ্ধ (এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধ) সংঘটিত হবার পরও জয় পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। দীর্ঘকাল বিরতিহীন যুদ্ধ চলতে থাকায় জার্মানির শক্তি অনেক কমে যায়। অন্যদিকে সম্পদশালী যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে মিত্র শক্তি নতুন উদ্যামে যুদ্ধ আরম্ভ করে। তাছাড়া মিত্র শক্তি প্রচার যুদ্ধেও জার্মানির মনোবল ভেঙ্গে দেয়। ফলে জার্মানবাহিনী ইউরোপ ও এশিয়ার সব রণাঙ্গনেই পরাজিত হতে থাকে। তার মিত্রবর্গ তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করে। জার্মানি নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং গণতন্ত্রপন্থীরা আন্দোলন শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দেশ থেকে পলায়ন করেন। জার্মানিতে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার ১৯১৮ সালে মিত্র শক্তির সাথে যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষর প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

জার্মানরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জাতি। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন সমর পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদ ও জনবল সব মিলিয়ে জার্মানি মিত্রশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। জার্মানির কামান ও ডুবো জাহাজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জার্মানির কোলন সেতু দিয়ে প্রতি দশ মিনিটে একটি করে সামরিক ট্রেন চলতো। কিন্তু এরপরেও জার্মানি পরাজিত হয়। ঐতিহাসিক ও সমর বিশেষজ্ঞতা এই পরাজয়ের কতকগুলো নির্ণয় করেছেন।

এগুলো হল ঃ-

ক. দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জার্মানির অক্ষমতা

একটি দেশ হিসেবে জার্মানির যে ক্ষমতা ছিল তাদ্বারা স্বল্পকালীন যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব ছিল এবং জার্মানি প্রথম দিকে এই জয় পেয়েছিল সত্য। কিন্তু জার্মানির পক্ষে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে মিত্র শক্তির সম্পদ ও শক্তি এমন ছিল যে, তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভারবহন

করতে সক্ষম ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থেকে সম্পদ ও সৈন্যদল সংগ্রহ করে। কিন্তু কোনো উপনিবেশ না থাকায় জার্মানির এই সুযোগ ছিল না। এটা জেনে মিত্র শক্তি যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে এই দীর্ঘ যুদ্ধে জার্মানির 'দম' ফুরিয়ে যায়।

খ. নৌশক্তিতে মিত্রপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব

ব্রিটিশ ও ফরাসি নৌবহর সমুদ্র পথে জার্মানিকে অবরোধ করায় বহির্বিশ্ব থেকে জার্মানির পক্ষে সামরিক সরঞ্জাম ও খাদ্য দ্রব্য আমদানি সম্ভব হয় নি। উত্তর সাগরে ইংরেজ নৌবহর এবং ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌবহর জার্মান উপকূলকে ঘিরে রাখে। জার্মান ডুবো জাহাজস্নারা ব্রিটিশ নৌ জাহাজগুলিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। এরই মধ্যে ব্রিটেন সাবমেরিন ধ্বংস করার অস্ত্র আবিষ্কার করলে জার্মানদের আক্রমণ অকার্যকর হয়ে যায়। হেলিগোল্যান্ডের নৌ-যুদ্ধে জার্মান নৌবহর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং এরপর জার্মানরা আর ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে আক্রমণ করার সাহস পায়নি। জলপথে ইংরেজ ও ফরাসিদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা তাদের সরবরাহ লাইনকে অক্ষুন্ন রাখে। অন্যদিকে একই ক্ষেত্রে জার্মানদের দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ. একই সময় একাধিক ফ্রান্টে যুদ্ধ এবং শক্তি ক্ষয়

১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জার্মানিকে একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধ করতে হয়। ফলে কোনো একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পুরু সৈন্য সমাবেশ করা জার্মানের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কূটনীতিস্নারা যদি জার্মানি তার পূর্ব সীমান্তের দেশ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক অথবা দেশটিকে নিরপেক্ষ রাখতে পারতো তাহলে জার্মানির বিজয়ের সম্ভবনা ছিল। কিন্তু জার্মানির কূটনীতি প্রথম দিকে সফল হয়নি। ১৯১৭ সালে রাশিয়া নিজ প্রয়োজনে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। রাশিয়ার শূন্যস্থানটি তখন পূরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ঘ. জার্মান রণকৌশলের দুর্বলতা

'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়' এই জার্মান রণকৌশলটি আপাতত চমকপ্রদ মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এই কৌশলের দুর্বলতা প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। অবশ্য জার্মানির হাতে বিকল্প কিছু ছিল না। কারণ, আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে দাঁড়াবার মত স্থান দেশটিতে ছিল না। যেমন রাশিয়া-তার বিরাট ভূখন্ডের জন্যে আক্রমণের মুখে পিছু হটে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করতে পারতো, জার্মানির কিন্তু অনুরূপ কোনো সুযোগ ছিল না।

ঙ. ফরাসিদের জনযুদ্ধ

হানাদার জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স সরকারকে সে দেশের আপামর জনগণ অভূতপূর্ব সহায়তা করে। ১৮৭০ সালে জার্মানির নিকট ফ্রান্সের পরাজয় দেশটির জনগণের মধ্যে জার্মান বিরোধী প্রবল জনমত সৃষ্টি করে। ফলে যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানি যখন দ্রুত বেগে রাজধানী প্যারিসের দিকে এগিয়ে যায় তখন ফরাসি জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

চ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান

ইউরোপে শক্তিসাম্য অব্যাহত রাখা, মার্কিন বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষা এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা চিন্তা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্র পক্ষের যুদ্ধে যোগদান করে। উদীয়মান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল সমর সম্ভার, জনবলসহ মিত্রপক্ষে যোগ দিলে জার্মানির জয়ের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. প্রথম মহাযুদ্ধে শুরু হয়-
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯১৪ (গ) ১৮৭০ (ঘ) ১৯২৫

২. ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো সাম্রাজ্যবাদ' কথাটি কে বলেছেন-
(ক) হিটলার (খ) মার্কস (গ) চেম্বারলিন (ঘ) লেনিন

৩. প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র বিশ্বে ব্রিটেনের উপনিবেশের পরিমাণ ছিল-
(ক) ৩০% (খ) ৪০% (গ) ৪৫% (ঘ) ৯০%

৪. বিসমার্ক কত সাল পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন-
(ক) ১৪৯০ (খ) ১৮৮০ (গ) ১৮৫০ (ঘ) ১৮৯৪

৫. আগাদি কোনো দেশের বন্দর-
(ক) সৌদি আরব (খ) ফ্রান্স (গ) মরক্কো (ঘ) মিশর

৬. ১৯১৪ সালের ২৮ জুন নিহিত অস্টিয়ার যুবরাজের নাম হল-
(ক) বিসমার্ক (খ) রুমেল (গ) হ্যানরী (ঘ) ফার্ডিনান্ড

৭. কোন জর্মান সেনাপতি রাশিয়ার কাছ থেকে রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া দখল করেন।
(ক) রুমেল (খ) হিন্ডেন বার্গ (গ) কাইজার (ঘ) বিসমার্ক

উত্তর : ১। (খ), ২। (ঘ), ৩। (গ), ৪। (ঘ) , ৫। (গ), ৬। (ঘ), ৭। (খ)

রচনামূলক প্রশ্ন
ক. প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন।
খ. প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনা করুন।
গ. প্রথম মহাযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
ঘ. প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১. উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ নির্ণয় করুন।
৩. আগাদির সমস্যা কি ?

পাঠ - ২

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্যারিস শান্তি সম্মেলন কি এবং এতে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারবেন;
- প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন কি?

প্যারিস শান্তি সম্মেলন হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলোর সাথে বিজয়ী দেশগুলোর শান্তি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্যারিসে আহূত একটি সম্মেলন। ১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী যুদ্ধক্লান্ত প্যারিসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের উত্তেজনা চূড়ান্তভাবে প্রশমিত হবার আগেই প্যারিসে এ ধরনের সম্মেলনের আয়োজন যুক্তিযুক্ত হয়নি। সুইজারল্যান্ডের ন্যায় কোনো নিরপেক্ষ দেশে শান্তি সম্মেলন হওয়া উচিত ছিল। বিজয়ী ফ্রান্স প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ১৮৭১ সালে সেডানের যুদ্ধে জার্মানির হাতে পরাজিত হয়েছিল এবং এই প্যারিসেই জার্মানি পরাজিত ফ্রান্সের উপর কতিপয় শর্ত আরোপ করেছিল। ফলে বিজয়ী ফ্রান্স পূর্ববর্তী অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্যারিসে সম্মেলন প্রধান ভূমিকা পালন করে।

শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবর্গ ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

সম্মেলনে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিত্তোরিও অর্ল্যান্ডো। ফরাসি প্রতিনিধি জর্জ ক্লিমেশোঁকে ঐ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে যারা সহযোগিতা করেছিল সেসব দেশের প্রতিনিধিরাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রথমোক্ত চারজনই। এজন্যে তাঁদেরকে 'চার প্রধান' (Big four) বলা হতো। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক, বুলগেরিয়াকে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়নি। চুক্তিপত্র রচনা সম্পন্ন হলে তা স্বাক্ষর করার জন্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ছিলেন গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে, জার্মানির বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে উইলসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। জার্মানিতেও উইলসনকে রক্ষাকর্তারূপে অভিহিত করা হয়েছিল। তবে ইউরোপীয় সমস্যা এবং দ্বন্দ্বমুখর রাজনীতি সম্পর্কে উইলসনের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলে তার উচ্চ আদর্শবাদ ইউরোপের সংঘাতময় রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধামন্ত্রী লয়েড জর্জ। তিনি ব্রিটিশ জনগণের পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট হয়েই সম্মেলনে এসেছিলেন। চারিত্রিক গুণাবলী, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ইউরোপীয় সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তার ছিল। ইউরোপীয় রাজনীতিতে ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্যে এখানে তিনি তার মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি, জর্জ ক্লিমেনশোঁ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কঠোর মনোভাবসম্পন্ন ক্লিমেনশোঁকে বলা হতো বাঘ (Tiger)। বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তিনি অংশগ্রহণকারীদের গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এটি হল জার্মানিকে পঙ্গু ও দুর্বল করে ফেলা। ইতালির প্রতিনিধি ভি অল্যাণ্ডো প্রকাশ্যে তার দেশের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করেন। মিত্র পক্ষে যোগদানের শর্ত হিসেবে ইতোপূর্বে বিভিন্ন গোপন চুক্তিতে ইতালিকে কয়েকটি ভূখণ্ড দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্যে তিনি সম্মেলনে প্রকাশ্যে চাপ প্রয়োগ করে বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন।

এই 'চার প্রধান' (Big Four) ব্যতীত অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ এবং দূর থেকে অনেকেই সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট পোয়াঁকারে এবং সেনাপাতি মার্শাল ফচ্ প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান না করেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জার্মানির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া। এ বিষয়ে তারা ক্লিমেনশোঁ অপেক্ষা কঠোর ছিলেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট উইলসনীয় আদর্শবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ব্যতীত আরও দুই প্রতিনিধি ছিলেন আর্থার ব্যালফোর এবং জর্জ বার্নেস নামে। গ্রিসের প্রতিনিধিত্ব করেন ভেনিজেলস। পোল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন রোমান দামোস্কি। জাপানের প্রতিনিধি ছিলেন কিমোচি ও নুবয়াকি থাকিনো। তারা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাপানি প্রতিনিধিরা ইউরোপের চেয়ে দূরপ্রাচ্যের ভবিষ্যত নিয়ে আগ্রহী ছিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনকে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ভিয়েনা সম্মেলনের মতো প্যারিসে উপস্থিত প্রতিনিধিরা আদর্শবাদের কথা ঘোষণা করে কার্যক্ষেত্রে স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতো রাষ্ট্রপতি উইলসন ছিলেন আদর্শবাদের প্রতীক। তাঁর চৌদ্দ দফা নীতি আলোচিত হয়েছে কিন্তু মানা হয়নি। কারণ যুদ্ধ চলার সময় অনেক দেশই পরস্পরের সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তারা সেগুলো রূপায়নের জন্যে সচেষ্ট ছিল। ফলে তারা উইলসনীয় আদর্শবাদকে স্বার্থসিদ্ধির আবরণরূপে ব্যবহার করেছিল।

তাছাড়া চার বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মিত্র রাষ্ট্রগুলো জার্মানির প্রতি তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করতো। প্রতিটি বিজয়ী রাষ্ট্রই নিজের জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগী ছিল। ফলে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে আদর্শবাদ ও বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে চলেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তবে শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বিজয়ী দেশসমূহের স্বার্থ চিন্তা এবং বাস্তববোধেরই প্রাধান্য সূচিত হয়েছিল। যুদ্ধক্লান্ত মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ জনমতের চাপে ও আশু ভবিষ্যতের কথা ভেবে আদর্শবাদকেই জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি

প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মিত্রশক্তিবর্গ ও বিজিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মোট পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

(১) জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles)

(২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মানের সন্ধি (Treaty of St. Germain)

(৩) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilley)

(৪) হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়ানর সন্ধি (Treaty of Trianon)

(৫) তুরস্কের সঙ্গে সেভার্সের সন্ধি (Treaty of Sevres)

(৬) সেভার্সের চুক্তি কিছুদিন পর সংশোধিত হয়ে ল্যাসেনের চুক্তি (Treaty of Lausanne) স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ভার্সাই প্যারিসের অদূরে অবস্থিত। সন্ধির খসড়া জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে দেখানো হয় ও মন্তব্য করতে খসড়ার বিভিন্ন শর্ত তাঁরা আপত্তি জানান, কিন্ত সেগুলো গ্রাহ্য হয়নি। একতরফা ভাবে ইউরোপের আঞ্চলিক পুনর্গঠন, সাময়িক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তাবলী জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন, বেলজিয়ামকে মরেসনেট, ইউপেন, মালমেডি, লিথুয়ানিকে মেমেল, পোল্যান্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রুশিয়ার অংশ বিশেষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ডানজিগ উন্মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষিত হয়। উপনিবেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অর্জিত বিশেষ অধিকারগুলো জার্মানিকে প্রত্যার্পন করতে বলা হয়। উত্তর সাইলেশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীগণ গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে তারা পোল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষপাতি কিনা। জার্মানির শিল্প ও খনিজ প্রধান সার (Saar) অঞ্চলে ১৫ বছরের জন্য ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

জার্মানি ভবিষ্যতে যাতে অন্য কোনো দেশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হতে না পারে সেজন্য তার সামরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করা হয়। রাইন নদীর পূর্বতীরে তিরিশ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল থেকে সবরকম সামরিক ঘাঁটি অপসারিত হলো। সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ কমিয়ে আনা হয়, বিমান ও নৌবাহিনীকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়। অস্ত্র উৎপাদন সীমিত করা হয়। জার্মানির ব্যয়েই মিত্রবাহিনীকে জার্মানিতে মোতায়েন করা হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নীতি বাতিল করা হয়।

জার্মান অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। জার্মান বাণিজ্য পোতগুলো ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। কয়লাসমৃদ্ধ সার অঞ্চল আপাতত অধিকার করায় জার্মান শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মানিকে কয়লা ও লোহা অন্যান্য দেশকে সরবরাহ করতে বলা হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর অর্থ জার্মানির ওপর ধার্য করা হয়।

বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য জার্মানিকে দায়ী করা হয়। এই অপরাধে সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে যুদ্ধাপরাধী বিচারের জন্য মিত্রপক্ষের কাছে সমর্পণের দাবি জানানো হয়। পরে অবশ্য এটি কার্যকর করা হয়নি। জার্মানির প্রতিবেশি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্তও ভার্সাই সন্ধিতে সংযোজিত হয়। রাষ্ট্রপতি উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতির ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ (League of Nation) গঠিত হয়। এছাড়া জার্মানি ও তার মিত্রবর্গের উপনিবেশগুলো কেড়ে নিয়ে জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অছি (Mandate) হিসেবে মিত্র রাষ্ট্রবর্গের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

'যুদ্ধ বন্ধের যুদ্ধ' ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধিগুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ভার্সাই সন্ধি যেহেতু জার্মানির সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল, সেহেতু এটিই সর্বাধিক আলোচিত ঘটনা। এক দিকে যেমন ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী ও যেভাবে আরোপিত হয়েছিল তা তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, অন্যদিকে তীব্র চাপের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়েছে তাও বিবেচনা করা উচিত।

ভার্সাই সন্ধিতে রাষ্ট্রপতি উইলসনের 'চৌদ্দ দফা' নীতির অধিকাংশই ভঙ্গ করা হয়েছে। আদর্শবাদকে পাশ কাটিয়ে সন্ধিটি পরাজিত অসহায় জার্মানদের ওপর জোর করে আরোপিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এটি শান্তি চুক্তি ছিল না, এটি বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। কেননা বিজিত পক্ষের প্রতিনিধিবর্গকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। জাতিপুঞ্জকে ভার্সাই সন্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত হয়নি। এর ফলে জার্মানরা প্রথম থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটিকে বিজয়ী মিত্র শক্তিবর্গের হাতিয়ার বলে মনে করতো। এই কারণে জাতিপুঞ্জ বা লীগের ভিত্তি প্রথম থেকেই ছিল দুর্বল। জার্মান বন্দর ডানজিগকে উন্মুক্ত করে, 'সার' খনি অঞ্চলকে জার্মানি থেকে পৃথক করে ও তিরিশ লক্ষ জার্মানকে নবগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তান্তরিত করে মিত্র রাষ্ট্রবর্গ রাষ্ট্রপতি উইলসনের ঘোষিত প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অমান্য করে।

নিরস্ত্রীকরণের (Disarmament) চুক্তিতে মিত্রশক্তি জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করলেও নিজেরা তা মেনে চলেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল দীর্ঘদিনের জটিল ঘটনা স্রোতের পরিণতি, এর জন্য কেবলমাত্র জার্মানিকে এককভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। কিন্তু জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী অপবাদ দিয়ে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণ দাবি করে জার্মানিকে মিত্ররাষ্ট্রবর্গের 'দাসে' পরিণত করা হয়। এর ফলে দেশটির অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

তদুপরি জার্মানির আরও কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল, যেমন আলসাস-লোরেন ফ্রান্সকে প্রদান, কিছু জার্মান অঞ্চল বেলজিয়ামকে, পোজেন ও পশ্চিম প্রুশিয়া, পোল্যান্ডকে প্রদান, 'সার' অঞ্চলকে ১৫ বছরের জন্যে জার্মানি থেকে পৃথকীকরণ এবং ডানজিগ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বা মুক্ত বন্দর ঘোষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এগুলো জার্মান জাতীয়াতাবাদকে দারুণভাবে আহত করে।

অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রশক্তি সেন্ট জার্মানির চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির বিভিন্ন ধারা পুরাতন অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যকে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলে। জাতীয়তাবাদ নীতিকে ফর্মুলা হিসেবে গ্রহণ করে উক্ত সাম্রাজ্যকে একাধিক নতুন রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। অস্ট্রিয়ান প্রদেশ রোহময়া ও মোরাভিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে এই দুটোকে একত্রিত করে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে সার্টিয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং এই সম্প্রসারিত নতুন রাষ্ট্রটি যুগোশ্লাভিয়া নামে পরিচিত হয়। এছাড়া দক্ষিণ টিরল, ট্রেনটিনো বন্দর ও দ্বীপ ইতালিকে দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়ান একটি জেলা পোল্যান্ডকে দেয়া হয় এবং হাঙ্গেরিকে অস্ট্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অস্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং জার্মানির সাথে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি এখানে রক্ষিত হয়নি।

মিত্রশক্তি হাঙ্গেরির সাথে স্বাক্ষর করে ট্রিয়াননের সন্ধি। এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯২০ সালে। এ সন্ধিদ্বারা হাঙ্গেরিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। হাঙ্গেরি কর্তৃক রুমানিয়াকে ট্রান্সিলভানিয়া, চেকোশ্লাকিয়াকে শ্লোভা প্রদেশ এবং যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোশিয়া দিতে বাধ্য করা হয়। অস্ট্রিয়ার ন্যায় হাঙ্গেরির সমুদ্রপথও সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়।

মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালে বুলগেরিয়ার সাথে লিউলির চুক্তি করে। এই সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়াকে গ্রিসের কাছে থ্রেস (Thrace) ছেড়ে দিতে হয়। এছাড়া মেসিডোনিয়ার কিয়দংশ যুগোশ্লাভিয়াকে এবং দোবরোজা (Dobruja) রুমানিয়ার কাছে অর্পণ করতে হয়।

মিত্রশক্তি তুরস্কের সাথে ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি করে। এই সন্ধিতে মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে এবং তারা বিরাট তুর্কি সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে একে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলে। তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দল এই সময় মোস্তাফা কামাল-এর নেতৃত্বে সুলতান কর্তৃক সেবার্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে পরবর্তীকালে তুরস্কের স্বার্থে মিত্রশক্তি নমনীয় শর্তে লাওসান (Lausanne) চুক্তি করে।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মূল্যায়ন

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি বিশেষত ভার্সাই সন্ধি ছিল ভালমন্দের সমাহার। প্যারিসে সমবেত শান্তির সংগঠকদের একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। ফলে এসব সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনা করে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের কার্যাবলী মূল্যায়ন করা উচিত।

সমবেত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের দেশের জনমতকে কোনো মতেই উপেক্ষা করতে পারেননি। প্রচুর রক্তের বিনিময়ে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে সেখানে বিজিত শক্তিগুলোর ওপর প্রতিহিংসার মনোভাব কাজ করবে, এটি ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সম্পাদিত গোপন চুক্তিগুলোকেও শান্তিচুক্তির মধ্যে স্থান দিতে হয়েছে, যেমন লন্ডন ও কনস্টান্টিনোপলের চুক্তি।

১৯১৯ সালে ইউরোপে দীর্ঘযুদ্ধের অবসানে ন্যায় নীতির ওপর শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ বাতুলতা মাত্র। সুপ্রাচীন শক্তিসাম্যের নীতিই রাষ্ট্রনায়কদের প্রভাবিত করতো বেশি। তা সত্ত্বেও অন্তত দুই দশক ইউরোপে শান্তি বজায় ছিল। রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদের মর্ম রাষ্ট্রনায়কগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কাইজারের জার্মানি ছিল আগ্রাসী মনোভাবের, কিন্তু শাস্তি দেওয়া হয় প্রজাতান্ত্রিক জার্মানিকে। প্যারিস সম্মেলনে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। জার্মানদের অতীত ইতিহাস বিচার করলে তাদের আপত্তির তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়। রাশিয়ার সঙ্গে ব্রেস্টলিটভসকের ও রুমানিয়ার সঙ্গে বুখারেস্টের চুক্তিতে জার্মানরাও যথেষ্ট কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল।

ভার্সাই তথা প্যারিসের সম্মেলন সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু শান্তি স্থাপনের জন্যে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে কাজ করেও তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। জাতিসংঘের জন্ম, নিরস্ত্রীকরণের ধারণা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতি আদর্শের উৎপত্তি এখানেই। আজও এদের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়নি।

ভিয়েনা ও ভার্সাই, এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি সাম্য বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ আদর্শকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপ একটি বিশেষ শক্তি থেকে ভীত ছিল, ১৮১৫-এ ফ্রান্স, ১৯১৯-এ জার্মানি। উভয়ক্ষেত্রেই মিত্ররাষ্ট্রবর্গ। নিরাপত্তার সঙ্গে আরোপিত শান্তি (Dictated Peace) মিশিয়ে ফেলেন। উভয় শান্তি সম্মেলনই ভবিষ্যত ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভার্সাই সন্ধি, আশীর্বাদ বা অভিশাপ যাই হোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। অনেক ভবিষ্যত ঘটনাবলীর উৎস এর মধ্যে নিহিত ছিল। পরবর্তী কয়েক দশকের ইউরোপীয় রাজনীতি প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ প্রভাবিত করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালের–
(ক) ১০ জানুয়ারি (খ) ১২ জানুয়ারি
(গ) ১৫ জানুয়ারি (ঘ) ১৮ জানুয়ারি।

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চার প্রধান কারা–
(ক) উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশোঁ ও অল্যাণ্ডো
(খ) রুজভেল্ট, স্ট্রালিন, চার্চিল ও দাগল
(গ) উইলসন, ক্লিমেশশোঁ, বালফুর, অল্যাণ্ডো
(ঘ) স্ট্যালিন, মুসোলিনি, কাইজার, ক্লিমেনশোঁ।

৩। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয় মোট চুক্তির সংখ্যা–
(ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি।

৪। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী কোন বন্দরকে মুক্ত বা আন্তর্জাতিক বন্দর ঘোষণা করা হয়–
(ক) ডানজিগ (খ) লণ্ডন
(গ) কায়রো (ঘ) কলকাতা।

৫। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে কে চৌদ্দদফা উত্থাপন করেন–
(ক) লয়েড জর্জ (খ) উড্রো উইলসন
(গ) ক্লিমেনশোঁ (ঘ) ব্যালফুর।

উত্তর ১। (খ) ২। (ক) ৩। (গ) ৪। (ক) ৫। (খ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।
২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করুন।
৩। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তির একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্যারিস সম্মেলন কী ?
২. 'বিগ ফোর' কী ?
৩. প্যারিস শান্তি সম্মেলনে কী কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?
৪. প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মূল্যায়ন কর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। E.H. Carr: *International Relations between the tow World War.*
২. Cornwell RD : *World History in the Twentienth Century.*
৩. এ,এইচ কার : দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (বাংলা একাডেমি)